গ্রহের ফের

(গল্পগ্রন্থ – মৌরীফুল)

“গত ২২শে অগ্রহায়ণ শনিবার কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউটে অধ্যাপক ৺নলিনাক্ষ রায়চৌধুরীর দ্বাদশ শ্রাদ্ধবাসরীয় স্মৃতি-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌—চ্যান্সেলর মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। গণ্যমান্য অনেক বক্তা উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। হলটি শ্রোতৃবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে কলেজের ছাত্রসংখ্যাই অধিক। অধ্যাপক রায়চৌধুরী মহাশয় বাঙ্গালী জাতির গৌরব ছিলেন; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, অদ্য দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার কোনো স্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া উঠিল না। সভার উদ্যোগীগণের উৎসাহ প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা স্বর্গতি অধ্যাপক-মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার কোনো স্থায়ী ব্যবস্থার উদ্যোগ করিলে দেশবাসীর সমধিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।”—

—দৈনিক বসুমতী, ২৩শে অগ্রহায়ণ।

অধ্যাপক ৺নলিনাক্ষবাবুর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হয়, বড় আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু সকালে উঠে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বসুমতীর প্যারাটা পড়তে পড়তে আর একজন লোকের কথা মনে পড়ে গেল। নলিনাক্ষবাবুর মত তিনি ভাগাবান পুরুষগ্য ছিলেন না, বর্তমানকালের তরুণদলের অনেকেই তাকে দেখেন নি, কারণ আজ আঠাশ বছর হোল তাঁর মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু যাঁরা দেখে থাকবেন তাঁরা সেই পক্বকেশ, সৌম্যদর্শন বৃদ্ধের চেহারা এখনও ভুলে যান নি নিশ্চয়ই।

আমি বলছি স্বর্গত রাজচন্দ্র সেন মহাশয়ের কথা।

নলিনাক্ষবাবু ও রাজচন্দ্রবাবু একই কলেজে পড়াশুনা করেছিলেন।নলিনাক্ষবাবু প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সরকারী বৃত্তি নিয়ে কেম্ব্রিজে যান এবং সেখান থেকে ফিরে এসে প্রেসিডেন্সি কলেজেই অধ্যাপক নিযুক্ত হন। রাজচন্দ্রবাবু তাঁর পূর্ব থেকেই সেখানে অধ্যাপক। আমি তখন ছাত্র। মোটে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছি পাড়াগাঁয়ের স্কুল থেকে এসে। ইভেন হিন্দু-হোস্টেলে থাকি। ভয়ে ভয়ে কলকাতার পথে বেড়াই, কি জানি কখন গাড়ি-ঘোড়া চাপা পড়ি, কি পথই হারিয়ে বসি। এত চায়ের দোকান তখন ছিল না, কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে দু’তিনটেই যা ছিল।জাত যাবার ভয়ে তার ত্রিসীমানায় কখনও পা দিতাম না। এ-সবের দরুনআজ-পাড়াগাঁয়ে বলে একটা অখ্যাতিও রটেছিল আমার নামে।

সেদিন শনিবার। বেশ মনে আছে কি একটা ছুটি উপলক্ষে আমি বাড়ি যাবো। শোনা গেল পদার্থ-বিদ্যার লেকচার-থিয়েটারে রাজচন্দ্রবাবু একটা প্রবন্ধ পড়বেন। উৎসাহে পড়ে হোস্টেলের আরও দশ জনের সঙ্গে আমিও গিয়ে গ্যালারিতে ভিড় বাধিয়ে তুললাম। খুব গোলমাল হচ্ছিল। হঠাৎ প্রবন্ধ-পাঠক বক্তৃতামঞ্চে উঠতেই গোলমাল থেমে সব চুপ হয়ে গেল। প্রকাণ্ড মাথা ও একমুখ আধকালো, আধপাকা খাটো ঘন দাড়ি, বেঁটে চেহারা, মাথাটা দেহের অনুপাতে অত্যন্ত বড়। শ্মশ্রুযুক্ত বামনের মত চেহারাখানা। চোখ দুটোর দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, চক্‌চকে ইস্পাতের মত একটা অস্বাচ্ছন্দ্যকর দীপ্তি। ফার্স্ট ইয়ার শ্রেণীর ছাত্র, উচ্চাঙ্গের গণিতবিষয়ক কোন প্রবন্ধ বোঝবার কোনো ক্ষমতা না থাকলেও, গ্যালারীতে ছাত্রের ভিড়, কলেজের বহু অধ্যাপকের উপস্থিতি, প্রবন্ধের ভেতরকার অপরিচিত বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাগুলি ও সেগুলির উচ্চারণধ্বনি, সকলের ওপর বক্তার চেহারা—সব মিলিয়ে আমার বড় ভালো লাগলো।

তারপর আরও বক্তৃতা তাঁর শুনেছি, যত বুঝি আর না-বুঝি, প্রত্যেক বারই আমার অন্ততঃ মনে হোত যে এমন একটা মনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে, যা পথে-ঘাটে সুলভ নয়। যে-ধরনের লোক পৃথিবীটার ওজন মাপে, বড় গির্জা গড়ায়, সৌর-জগতের বয়স ঠিক করে জোয়ারের সঙ্গে সময়ের সম্বন্ধ খাড়া করে, পৃথিবীর রেডিয়াম-ভাণ্ডার ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়--রাজচন্দ্রবাবুকে সেই শ্রেণীর মানুষ বলে মনে হোত। নলিনাক্ষবাবু বা রাজচন্দ্রবাবু কেউই আমাদের ক্লাসে পড়াতেন না। কলেজের তেতলার বারান্দায় কতদিন বক্তৃতা-ঘণ্টার ফাঁকে দেখতাম রাজচন্দ্রবাবু অন্যমনস্ক হয়ে হেঁটে চলেছেন—এ অবস্থায় অনেক সময় তিনি নিজের পড়ানোর ক্লাসটিতে যেতে ভুলে গিয়ে হঠাৎ অন্য এক অধ্যাপনারত অধ্যাপককে বিপন্ন করে তাঁর ক্লাসটিতে ঢুকে পড়তেন এবং পরক্ষণেই চমক ভেঙে অস্ফুটস্বরে কি বলেই সে ঘর থেকে বার হয়ে পড়তেন। ছেলেরা বলাবলি করতো, তিনি সব সময় গণিতের উঁচু বিষয় চিন্তা করেন,পৃথিবীর মাটির খবর রাখেন না।

তা না রাখুন তাতে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু রাজচন্দ্রবাবু উপরওয়ালার মেজাজের খবরটাও বড় একটা রাখতেন না বা রাখার জন্যে গ্রাহ্যও করতেন না। এটাই ছিল তাঁর মহৎ দোষ। প্রিন্সিপাল লসন সাহেবের নাম

প্রেসিডেন্সি কলেজের সে সময়ের ছাত্রদের কাছে আর দু—বার বলবার দরকার হবে না—খুব ভাল লোক, দর্শন ট্রাইপসে জয়পতাকা উড়িয়ে পাস! সুতরাং শুধু হাকিমী চালচলনের প্রিন্সিপাল নন, বিদ্বানও বটে। তিনি রাজচন্দ্রবাবুকে অনেক রেহাই দিয়ে চলতেন। কিন্তু নিজের ডিপার্টমেন্টের উপরওয়ালা নলিনাক্ষবাবুর সঙ্গে রাজচন্দ্রবাবুর বনিবনাও ছিল না আদৌ। কতদিন ছেলেরা দেখেছে, নলিনাক্ষবাবুর খাসকামরা থেকে রাজচন্দ্রবাবু অপ্রসন্ন মনে বিড়বিড় করে কি বকতে বকতে দাড়িতে হাত বুলাতে বুলোতে দুঁদে সওয়ারের পাল্লায়-পড়া বিপন্ন একরোখা ঘোড়ার ভঙ্গিতে বার হয়ে গেলেন। নলিনাক্ষবাবুর হুকুম ঠিক মত তামিল না করার মূলে রাজচন্দ্রবাবুর যে ইচ্ছাকৃত কোনো অবিনয় ছিল তা নয় বোধহয়—তাঁর স্বভাবই ছিল সাধারণতঃ অন্যমনস্ক ধরনের। নলিনাক্ষবাবু অধস্তন কর্মচারীর এ রকম লর্ড কেলভিনের মত মেজাজ বরদাস্ত না করতে পেরে এবং সেটাকে তাঁর হুকুমের প্রতি সরাসরি ভাবের অন্য ভেবে নিয়ে, সব সময় পঞ্চমে চড়ে থাকতেন।

আমার সহপাঠী প্রতুল হোস্টেলে আমার পাশের ঘরেই থাকতো।অঙ্কে খুব পাকা হুগলী জেলা থেকে টেম্পল বৃত্তি নিয়ে এন্ট্রান্স পাস করে। চেহারা বেশ ভাল, আর একটু সেন্টিমেন্টাল ধরনের ছিল বলে তাকে সকলে মিস্ গুপ্ত বলে ডাকতো। সেদিন সন্ধ্যার সময় সে হোস্টেলের বারান্দায় বসে আমার কাছে গল্প বললে, বিকালে রাজচন্দ্রবাবুর বাড়ি গিয়েছিল। সেখান থেকেই আসছে। আমি জানতাম, কলেজে যে সব ছেলে মুগ্ধ ভক্তের অর্ঘ্য নিবেদন করে প্রতুল সে-দলের একজন চাঁই। যেমন হয়ে থাকে কলেজে, ছেলেরা যে প্রফেসারকে পছন্দ করে, তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জমায়। প্রতুলও তারপর থেকে সপ্তাহে দু'দিন তিনদিন রাজচন্দ্রবাবুর বাড়ি যাতায়াত শুরু ক'রে দিলে।...একমাত্র মেয়ে ছাড়া তাঁর সংসারে কেউ নেই, বা তাঁর মেয়ের নাম যে প্রভাবতী, এ-সব কথা আমি ঐ প্রতুলের মুখেই শুনেছিলাম। প্রতুলের মুখেই শুনতাম তাঁর বাড়িতে চায়ের বন্দোবস্ত ছিল না, কারণ তিনি নিজে চা খান না—ছেলেরা যাতায়াত শুরু করার পরে প্রভাবতী বাবাকে বলে চায়ের সমস্ত সরঞ্জাম আনিয়ে নিয়েছেন—নিজে চা পরিবেশনকরেন, কাজেই আজকাল এদের—বিশেষ করে প্রতুলের কোনো অসুবিধা হয় না।

হঠাৎ একদিন মনে হোল রাজচন্দ্রবাবুর বাড়ি না-যাওয়াটা তাঁর প্রতি অত্যন্ত অসম্মান ও ঔদাসীন্য দেখানো হচ্ছে। উঁহু—সেটা ঠিক নয়। পরের রবিবার প্রতুলের সঙ্গে বিকেলের দিকে তাঁর ওখানে গিয়ে হাজির হওয়া গেল। রাজচন্দ্রবাবু তখনও ওপরে নিজের ঘরটিতে পড়াশুনায় ব্যস্ত আছেন। তাঁর মেয়ে আমাদের বসালেন, চা ও খাবার তৈরী হোল, খানিকক্ষণ গল্পসল্পও হোল। তাঁর কতবার্তায় মনে হোল রাজচন্দ্রবাবু অন্য বিষয়ে যতই অন্যমনস্ক হোন না কেন, মেয়েটির শিক্ষা দেওয়া বিষয়ে মোটেই ঔদাসীন্য দেখান নি।

তারপর আমরা ওপরের ঘরে গেলাম।আগাগোড়া দেওয়াল বইভরা আলমারীতে ঢাকা পড়েছে। মেজের ওপর এখানে ওখানে যদৃচ্ছামত বই ছড়ানো।দেখে মনে হয় আলমারীভরা বই শুধু সাজানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না। দিস্তা দিস্তা সাদা কাগজে লম্বা লম্বা আঁকজোক ভরা তক্তপোশের ওপর, টেবিলে ছড়ানো "f" অক্ষরের বাড়াবাড়ি খুব, অনধিকারীকে যেন চাবুক উঁচিয়ে তাড়া করে আসছে। দেশের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যক্ষদের সঙ্গে রাজচন্দ্রবাবুর পত্র-ব্যবহার হয় বা তাঁদের দু'একজনের সঙ্গে পরিচয় যে খুব ঘনিষ্ঠ তাও রাজচন্দ্রবাবুর অনুপস্থিতির ফাঁকে প্রতুল খানকতক চিঠি দেখিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিলে। হোস্টেলে এসে গল্পের সময় তাঁদের মধ্যে হেনরী রবার্টসন ও হ্যারল্ড জেফ্রিস্—দু'টো নাম শুনে একজন এম্-এ শ্রেণীর গণিতের ছাত্র বললে, বর্তমানকালে এঁরা নাকি গণিতের দুই দিক্‌পাল।

কলেজে নলিনাক্ষবাবু "On ইত্যাদি ইত্যাদি" নামক এক দুর্বোধ্য প্রবন্ধ পাঠ করলেন।প্রিন্সিপাল তখন ছিলেন সভাপতি। অন্যান্য অধ্যাপক ও উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত ছিলেন। গণিতের অধ্যাপকেরা প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপিটা একবার দেখবার জন্যে নলিনাক্ষবাবু বক্তৃতামঞ্চ থেকে নামলেই কাড়াকাড়ি শুরু করলেন।কেবল রাজচন্দ্রবাবুর কোনো উৎসাহ লক্ষ্য করা গেল না। তিনি নাকি, প্রতুল শুনে এল, বাড়িতে বলেছেন—নলিনাক্ষবাবু প্রবন্ধের অধিকাংশই ভিত্তিহীন। অত অসম্পূর্ণ data-র ওপর নলিনাক্ষবাবুর মত বিচক্ষণ লোক যে কি করে তাঁর বক্তব্য খাড়া করেছেন তা ভেবে রাজচন্দ্রবাবু আশ্চর্য হয়ে গেছেন—ইত্যাদি।

এর মাস পাঁচেক পরে PhilosophicalMagazine-এ রাজচন্দ্রবাবুর একটা প্রবন্ধ বার হোল। তাতে শুনলাম, তিনি নলিনাক্ষবাবুর মতবাদকে খণ্ডন করেছেন, যদিও নলিনাক্ষবাবুর প্রবন্ধের উল্লেখ কোথাও তিনি করেন নি। প্রতুল কলেজের লাইব্রেরীতে দেখালে, অক্সফোর্ডের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ অধ্যাপক 0'sullivan তাঁর Geometry of Hyper-Spaces সংক্রান্ত নূতন বইয়ে অধ্যাপক সেনের অনুসন্ধানের যথেষ্ট সাহায্য নিয়েছেন

এবং গণিতের এই নূতন শাখায় অধ্যাপক সেন যে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন—মনীষী অধ্যাপক সে-কথা নিজ গ্রন্থের যথাস্থানেস্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন।

একদিন রাজচন্দ্রবাবুর বাড়িতে আমাদের নিমন্ত্রণ হোল। প্রভাবতীর হাতের রন্ধনের প্রশংসা এর আগে প্রতুল দু'একদিন করেছিল বটে—খুব যে বাড়িয়ে বলেছিল তা মনে হোল না। প্রভাবতী আমাদের সঙ্গে যত শান্ত, অসঙ্কোচ ও সহজ ব্যবহার করতেন ততই আমাদের, বিশেষ করে আমার আনাড়ি ভাবটা যেন বেড়েই চলেছিল; কোন রকমে নিমন্ত্রিতের কর্তব্য সমাপ্ত করারপর রাজচন্দ্রবাবুর আহ্বানে তাঁর ঘরে গেলাম। ঘরে টেবিল চেয়ার তত ছিল না।তিনি তাকিয়া ঠেস দিয়ে তক্তপোশের ওপর বসে আরাম করছিলেন। কথায় কথায় বললেন—ওহে, একটা জিনিস বার করে ফেলেছি। ঠিক তিন বৎসর পরে একটা ধূমকেতু আসছে—এটা জানাশোনা বা তোমাদের ক্যাটালগের বাইরের জিনিস—এটা হয় আসছে প্রথমবার, নয়তো অনেকদিন পরে। ঠিক তিন বছর পরে আমাদের আকাশে দেখা যাবে। তারপর তিনি জানালেন, অন্য একটা বিষয়ের অনুসন্ধান করতে এই ধূমকেতুর আসবার সন্ধান তিনি পেয়েছেন—তবে এটা ঠিক যে বৈজ্ঞানিকদের তালিকাভুক্ত ধূমকেতু তা নয়।

একটা কিসের বন্ধে ছুটি হোল। হয়তো গ্রীষ্মের হবে, ঠিক মনে নেই। অনেকদিন পর দেশ থেকে কলকাতায় এসেছি। ছুটির সময় রাজচন্দ্রবাবু তাঁর দেশ ঢাকা জেলায় চলে যেতেন তা জানতাম। এসেছেন কিনা দেখতে তাঁদের বাসায় গেলাম। প্রভাবতীকে দেখতে পেলাম না। বাড়িতে অন্য কোনো চাকর-বাকরও ছিল না—সকালে ওপরের ঘরে আছেন ভেবে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে রাজচন্দ্রবাবুর ঘরে ঢুকতেই দেখলাম তিনি একমনে কি লিখছেন—মুখ তুলে আমাকে দেখেই রুক্ষসুরে গরম মেজাজে বলে উঠলেন—কে?...যাও যাও, যাও যাও...

কথা শেষ না করেই যেন মনে হোল, তক্তপোশ থেকে কি একটা তুলে ছুঁড়ে মারতে গেলেন।

হঠাৎ পেছন থেকে চোখ টিপে ধরলে মানুষ যেমন অতর্কিতভাবে হতভম্ব হয়ে পড়ে— সেই রকম হয়ে পিছু হটে রাজচন্দ্রবাবুর ঘর থেকে বার হয়ে এলাম। পরে কাঠের পুতুলের মত মুখ ফিরিয়ে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নামতে গিয়েই দেখি, প্রভাবতী উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে—বোধহয় চীৎকার শুনে তিনি এইমাত্র নিচে থেকে ছুটে উঠে আসছিলেন। আমাকে দেখে শুষ্কমুখে বললেন—আসুন, নিচে আসুন অমলবাবু। দেশ থেকে কবে এলেন?

আমার বিস্ময় তখনও যায় নি, কথার উত্তর খুঁজে দিতে দেখি তাঁর চোখ দুটি জলে ভরা।বললেন—আজ মাসখানেক হোল বাবা ওই রকম হয়েছেন—এক আমি ছাড়া কেউ কাছে যেতে পারে না। খান না, শোন্ না—কি সব অঙ্ক কষেন বসে বসে রাতদিন। মাথা একেবারে ঠিক নেই—ছুটিতে দেশে যাওয়া হয় নি। কি যে হবে অমলবাবু!

তাঁকে যথেষ্ট সাহস ও সান্ত্বনা দিয়ে সেদিন হোস্টেলে ফিরলাম। তারপর কয়েকমাস। প্রতুল ও আমি রাজচন্দ্রবাবুর ওখানে প্রায়ই যেতাম। তাঁদের দেশ থেকেও প্রভাবতীর বড়মামা এসে কিছুদিন থাকলেন।

কলেজে তাঁর চাকরি আর বেশীদিন থাকা সন্দেহের বিষয় হয়ে দাঁড়ালো।দিন দিন তাঁর অপ্রকৃতিস্থতা যেন পরিস্ফুট হয়ে বেড়ে যেতে লাগলো।বেচারী নলিনাক্ষবাবু প্রকৃতিস্থ অবস্থাতেই তাঁকে সামলাতে হিম্‌সিম্ খেতেন, এ অবস্থায় তো হাল ছেড়ে দিয়ে শুধু প্রিন্সিপালের কাছে লম্বা লম্বা নোট পাঠাতে লাগলেন। চাকরিতে দীর্ঘদিনব্যাপী ছুটি নিয়ে নিয়ে শেষে ইস্তফা দিতে হোল।

তারপর কলকাতার বাস উঠিয়ে তাঁরা চলে গেলেন শিবপুর ব্যাঁটরা অঞ্চলে। সেখান থেকে চলে গেলেন চন্দননগরে গঙ্গার ধারে একটা ছোট বাড়িতে।

ইতিমধ্যে প্রতুল একবার সেখানে গিয়েছিল। ফিরে এসে বললে, তাঁরা সামান্যভাবে আছেন, খড়ের বাংলো ঘরে থাকেন। রাজচন্দ্রবাবু অনেকটা ভাল আছেন। কলকাতার বাইরে গিয়ে অনেকটা সুস্থ হয়েছেন আজকাল। রোজ সন্ধ্যার আগে গঙ্গার ধারে খুব বেড়ান, কোনো কোনো দিন গ্রামের বাইরের মাঠে গিয়ে এক জায়গায় বসে বসে ওয়াটার-কলার ছবি আঁকেন শুনলাম। এ সংবাদটা নতুন এবং অদ্ভুত লাগলো।তুলি ও ইজেল হাতে রাজচন্দ্রবাবুর ছবিটা মনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারলাম না কোনো রকমে। ডাক্তারের পরামর্শে অবসর সময়ে চিত্রবিদ্যার চর্চা আরম্ভ করেছেন, গণিতের কেতাব সব আলমারীর মধ্যে চাবিবন্ধ।

পুজোর ছুটিতে তাঁদের ওখানে গেলাম। প্রভাবতী ভারী আনন্দ প্রকাশ করলেন। রাজচন্দ্রবাবুকে অনেক সুস্থ বলে মনে হোল বটে, কিন্তু আগেকার মত যেন দেখলাম না।

রাজচন্দ্রবাবু বললেন—ওহে, তোমরা ধূমকেতুর কথা ভুলে যাওনি তো?...ওটা আসছে কিন্তু ঠিক...

আমি বললাম—আগে এটা এসেছিল কখনো?

রাজচন্দ্রবাবু বললেন—এসেছিল নিশ্চয়ই, তবে অনেকদিন আগে। মানুষ তখন শিশু ছিল।প্যারাবোলার পথে ঘুরতে—বড় প্যারাবোলার পথে ঘুরে আসতে অনেক বছর কেটে গিয়েছে...

আমি না বুঝতে পেরে বললাম—প্যারাবোলায় ঘুরলে সেটা কি ফিরে আসবে আবার—

তিনি বললেন—কেন আসবে না? বড় প্যারাবোলা আর কিছু না—Ellipse-ই—তবে চ্যাপ্টা খুব বেশী, যাকে বলে Eccentricity খুব বেশী। অন্য ধূমকেতুর পথ ছোট Ellipse, মানুষের জ্ঞানের মধ্যেই হয়তো দু'বার আসতে পারে—হতে পারে এর পথ ঘুরতে লেগেছে পাঁচ হাজার কি দশ হাজার বছর!—দশ হাজার বছর আগে যখন এসেছিল তা মানুষের ইতিহাসের বাইরে...

তারপর সরল বৃদ্ধ অপ্রতিহতভাবে বললেন—ওহে, এটা তোমরা দাও না কাগজে-টাগজে লিখে! তারপরই তাঁর সেই প্রাণখোলা হাসি।

কলকাতায় ফিরে খুব হইচই করা গেল। রাজচন্দ্রবাবুর লেখা এক চিঠি নিয়ে এলাম বঙ্গবাসীর সম্পাদকের নামে। বঙ্গবাসী তখন নামজাদা পয়সাওয়ালা কাগজ। বঙ্গবাসীতে বড় শিরোনামা ফেঁদে কথাটা ছাপা হোল। ক্রমে হিতবাদী, বসুমতী, ঢাকাপ্রকাশ, তখনকার সব বড়কাগজেই কথাটা ছড়িয়ে গেল।

তখনও অবশ্য তিন বৎসর বাকী। কথাটা দু'একবার আলোচনা হয়েই থেমে গেল।

তারপর কি হোল, সে-কথা এখনও বোধহয় অনেকে ভুলে যাননি। তখন রুশ-জাপান যুদ্ধের সময়।জাপানীরা পর পর চেষ্টা করেও পোর্ট আর্থার দখল করতে পারছে না। জেনারেল স্টোশেল বন্দরের মধ্যে ইঁদুর-কলে আটকা পড়েছেন—ও-দিকে বাল্‌টিক-বন্দর চলে আসছে নৌ-সেনাধ্যক্ষ রোজডেস্টভস্কির অধীনে। স্পেনের গ্যালিসিয়া প্রদেশের বন্দরটাতে কয়লা নিতে গিয়ে বন্দরের কর্তৃপক্ষের অদূরদর্শিতার ফলে যে গোলমাল সৃষ্টি হয়েছিল, কাগজওয়ালারা তা নিয়ে খুব ব্যস্ত আছে। সকলে বলেছে, এইবার একটা আন্তর্জাতিক বিপ্লবের সূত্রপাত না হয়েআর যায় না। লোকে ভারী খুশী আছে, অনেকে রাত্রে ভাল করে ঘুমোয় না।

এমন সময় সংবাদ এল, স্পেনের সঙ্গে সে-বিবাদ রুশ মিটিয়ে ফেলেছে ইংরেজের মধ্যস্থতায়। অনেক হুজুগী লোক বড় আশাভঙ্গ হয়ে একেবারে শয্যাগ্রহণ করলো।

ঠিক এই সময়ে এই ধূমকেতুর আবির্ভাব যেন সংবাদপত্র-গগনে হৈ-হৈ পড়ে গেল।যেদিন আসবার দিন কাগজে ছাপা হয়েছিল সেদিনের কথা এখনো অনেকেরই নিশ্চয়ই মনে আছে। সেদিন-রবিবার, ৭ই জুন। সন্ধ্যার অনেক আগে থেকেই লোক ছাদে স্থান গ্রহণ করে দাঁড়িয়ে রইলো।ভাল করে দেখতে পাওয়া যাবে বলে অনেকে কলকাতার বাইরে চলে গেল। নতুন অপেরা-গ্লাসের কাট্‌তি 'লরেন্স ও মেয়োর' দোকানে খুব বেড়ে গেল। বঙ্গবাসী ও সন্ধ্যা কাগজে রাজচন্দ্রবাবুর ছবি বেরুলো।উৎসাহী দু'একখানা কাগজ তাঁর সংক্ষিপ্ত কাল্পনিক জীবনকথাও লিখে ফেললে। বিদ্যুতের ট্রাম তখন কলকাতায় নতুন হয়েছে—মোড়ের ওপর ট্রামযাত্রীদের কাছে দৈনিক বঙ্গ-সুহৃৎ খুব বিক্রি হয়ে গেল—তারা উৎসাহের আতিশয্যে আগন্তুক ধূমকেতুর ছবিটা পর্যন্ত দিয়ে দিল।

এরকমও একটা গুজব রটেছিল যে, ধূমকেতুর পুচ্ছটার সঙ্গে একটা বিরাট ধাক্কা খেয়ে পৃথিবীটা একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। এই সংবাদটা দু'একটা হিন্দী কাগজে রটে যাওয়ায় মাড়োয়ারীরা বেঙ্গল ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা ওঠাতে শুরু করে দিল। একটা ছোট নতুন স্বদেশী ব্যাঙ্কএকদিনে দশটা থেকে ছ'টার মধ্যে একলক্ষ ষাট হাজার টাকা নগদ আদায় দিয়ে লালবাতি জ্বালাবার যোগাড় করে তুললে। কিন্তু এক দুর্বোধ্য যুক্তিবলে সকলেই ঠাওরে নিলে, ধূমকেতুর লেজের ধাক্কায় বেঙ্গল ব্যাঙ্ক চুরমার হয়ে গেলেও তাদের লোহার সিন্দুকগুলো প্রাণে বেঁচে যাবে।

আমি তখন আর হোস্টেলে থাকি না, বহুবাজারের মোড়ে একটা মেসে থাকি। সন্ধ্যার সময় প্রতুল আমার বাসায় এল। দু'জনে ছাদে উঠলাম। আশে-পাশের ছাদ লোকে লোকারণ্য। ভীমনাগের সন্দেশের দোকান বন্ধ, ফুলওয়ালাদের দোকান বন্ধ, সেদিন তারা ছাদ ভাড়া দিয়েছে। ক্রমে বেশ অন্ধকার হলো। তখনও ধূমকেতুর কোনো সন্ধান নেই। রাত্রি আটটা বেজে গেল। ন'টা—দশটা—এগারোটা। ভিড় ক্রমে পাতলা হয়ে এল। ফুলওয়ালারা মাল কাটাবার জন্যে অগত্যা অর্ধেক দরে মালা বিক্রি করতে লাগলো। আরও রাত হোল—কিন্তু কিছু হোল না।

প্রতুল আমায় বললে—এখন না, শেষ রাত্রের দিকে উঠবে...

সারা রাত্রির মধ্যে অনেকে মাঝে মাঝে ছাদে উঠে দেখতে লাগলো। সে-রাত্রে অনেকেরই ঘুম হোল না। কিন্তু কেউ কিছু দেখতে পেল না।

তার পরে আজ-কাল করে' এক সপ্তাহ, ক্রমে দু'সপ্তাহ কেটে গেল, ধাক্কা খাবার ভয়ে যারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিল তারা আশ্বস্ত হোল, ধাক্কা তো দূরের কথা—ধূমকেতুর পুচ্ছের একটা পালকও কারু নজরে এল না।

কলেজে খুব হাসাহাসি হোল। নলিনাক্ষবাবু এতদিন চুপ করে ছিলেন, বোধহয় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর গণিতের প্রতিভার ওপর গোপনে গোপনে তিনি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। এবার তিনি ক্লাসে এসে বললেন (তখন তিনি আমাদের পড়ান) যে, পূর্ব থেকেই তিনি জানতেন ও কিছু নয়। রাজচন্দ্রবাবুর মত বিচক্ষণ লোক যে কি data-র ওপর এ আজগুবি খবর খাড়া করলেন তা তিনি ভেবে আশ্চর্য হয়েছিলেন; তবে পাছে অশোভন হয় এজন্য কোনো কথা বলেন নি। এমন কথারও আভাস দিলেন যে রাজচন্দ্রবাবুর মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ না হওয়ার দরুনই এই সব গোলযোগ এবং তাঁকে নিবৃত্ত না করার দরুন আমাদের মৃদু ভর্ৎসনাও করলেন।

এ ক্ষেত্রে যা হয় তাই হতে লাগলো।কাগজপত্রে, লোকের মুখে খুব গালাগালি চললো। নিরীহ রাজচন্দ্রবাবু কারুর কোনো অনিষ্ট করেন নি, বরং ধূমকেতুর ধাক্কা খাওয়ার দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচিয়ে লোকের ইষ্টই করেছিলেন—কিন্তু আমাদের একটা বৃহৎ আশা দিয়ে তা থেকে বঞ্চিত করার অপরাধে তাঁকে কেউ ক্ষমা করলে না। স্টেটস্‌ম্যান, ইংলিসম্যান, মুচকে হাসলে। যে কাগজে ধূমকেতুর ছবি বেরিয়েছিল, তারা ভালমানুষটি সেজে ধূমকেতুর আসা না-আসা সম্বন্ধে কোনো উল্লেখই করলে না। কলেজের নোটিশ বোর্ডে রাজচন্দ্রবাবুর ভক্তের বিপক্ষদলেরা খড়ি দিয়ে একটা ছবি আঁকলে...

দিন কুড়ি পরে প্রভাবতীর পত্র পেলাম, রাজচন্দ্রবাবুর অত্যন্ত অসুখ, একবার আসবেন।—অত্যন্ত অনুরোধ করেছেন।

প্রতুল ও আমি রাজচন্দ্রবাবুকে দেখতে গেলাম। তখন বৃদ্ধ একেবারে শয্যাগত, জ্ঞান নেই। প্রভাবতীর মুখে শোনা গেল, ক'দিন ধরে বৃদ্ধ অনবরত আঁকজোক কষেছেন—তারপরই হঠাৎ ঘাড়ে ও পিঠে ব্যথা হয় এবং রাত্রে খুব জ্বর হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। ডাক্তার মত দিয়েছেন, অতিরিক্ত মস্তিষ্কচালনার ফলেই এরূপ দাঁড়িয়েছে।

আমার যাওয়ার তিনদিন পরে বৃদ্ধের অবস্থা আগের চেয়ে একটু ভাল হোল। সন্ধ্যার ঠিক আগে তাঁর বিছানার পাশের খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তিনি বালিশ ঠেস্ দিয়ে বসেছিলেন। প্রভাবতী, আমি, প্রতুল ও আরো দু'জন ছাত্র—আমরা সকলে তাঁর বিছানার পাশেই বসেছিলাম। হঠাৎ বৃদ্ধ ধীর ভাবে বললেন—ওটা আসছে—আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, প্রকাণ্ড Parabola-র পথে ঘুরে আসছে—আকাশের দিকে চোখ চেয়েই আমি সেটা দেখতে পাচ্ছি।

পরদিন প্রতুল সকালে আমার কাছে এল। বললে—একটা কথা আছে শোনো।তারপরসে বললে—অনেক রাত্রে রাজচন্দ্রবাবুর বিছানার পাশে প্রভাবতী জেগে বসেছিলেন, বৃদ্ধ মেয়েকে বলেছেন—তুমি সকলেকে বলে' দিও, হিসাব কষ্‌তে আমার পঁয়তাল্লিশ দিনের ভুল হয়েছে—আমি যেদিন বলেছিলাম তার পঁয়তাল্লিশ দিন পরে ধূমকেতু ঠিক আসবে। কোনো ভুল নেই, আসতেই হবে। বলে দিও ছেলেদের।..প্রভাবতী এ-কথা প্রকাশ করেছেন মাত্র, কিন্তু বৃদ্ধের কথা প্রলাপ কি সুস্থ মনের উক্তি না বুঝতে পেরে, কথার ওপর কোনো আস্থা স্থাপন করেন নি।

সেদিন শেষরাত্রে বৃদ্ধের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে এল, দুপুরের পর তিনি মারা গেলেন।

কলকাতায় ফিরে এসে আমরা পরামর্শ করলাম, এ-কথা আর প্রকাশ করবার উপায় নেই—মৃত ব্যক্তির শিরে আর বিদ্রূপ বর্ষণ করার আয়োজন করে কি হবে? প্রতুলের মত মুগ্ধ ভক্ত রাজচন্দ্রবাবুর ছাত্রদের মধ্যে আর কেউ ছিল কিনা জানি না। সেও কিন্তু আমার প্রস্তাবে রাজী হোল। প্রিন্সিপ্যাল লসন সাহেব কলেজ একদিন বন্ধ রাখলেন।

আরও কুড়ি দিন কেটে গেল। পঁয়তাল্লিশ দিনের দিন মনের মধ্যে এমন একটা অদম্য কৌতূহল সকাল থেকেই শুরু হোল যে, কোনো রকমে অন্যমনস্ক না হোলে সময় কাটানো অত্যন্ত কষ্টকর হোত বিবেচনা করেই সন্ধ্যার পর আমি থিয়েটার দেখতে গেলাম। দর্শকগণের উল্লাসের ও করতালির গণ্ডগোলের মধ্যেও কথাটা কেবলই আমার মনের মধ্যে যাতায়াত করতে লাগলো।

রাত্রি বারোটার পর মেসে ফিরে এলাম। আস্তে আস্তে ছাদে উঠে প্রতুলকে বললাম— চলে আয় ভাই, নেমে আয়। রাত অনেক হয়েছে।

অনেকক্ষণ থেকে সে ছাদের ওপর হাঁ করে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। প্রতুলের চোখে জল এল। লোকে তাকে যতই সেন্টিমেন্টাল বলুক, নলিনাক্ষবাবুকে মনে মনে কৃপার পাত্র ভাবলাম সে রাত্রে, এ-রকম একজন মুগ্ধ একনিষ্ঠ ভক্ত ছাত্র লাভ করার সুযোগ তাঁর হয়নি বলে— উঠুন গিয়ে তিনি ইম্পিরিয়াল গ্রেডে!

কত রাত্রে জানি না....

কে ডাকছে—অমল...অমল...

ঘুম ভেঙে গেল। মেসের চার পাঁচজন ছেলে ব্যস্তভাবে বললে, শীগ্‌গির এসো ছাদে—একেবারে তে'তলায় চলো।প্রতুলকেও তারা ডেকে ওঠালে।

প্রতুল ভূতগ্রস্তের মত দৌড়ে ছাদে উঠলো।

রাত্রি তিনটের সময়। নৈর্ঋত কোণ আলো হয়ে উঠেছে। দূরে গোলতলার মিশনারী স্কুলটার মাথার ওপর দিয়ে, আকাশের সেইদিকটা আলো করে তুলে Astronomy-র পাঠ্য-কেতাবের ছবির মত অবিকল প্রকাণ্ড ধূমকেতু।...তবে পুচ্ছটা যেন একটু বাঁকা—ঠিক সোজা নয়, আর ঠিক পাশাপাশি দৃষ্টি না পড়ায়, একটু চ্যাপ্টা গোছের দেখাচ্ছে।...গোল অংশটা আমাদের দিকে ফেরানো, আর বাঁকা ঝাঁটার মত পুচ্ছটা মিশনারী স্কুলের ছাদ ছাড়িয়ে ধর্মতলার গির্জার দিকেপ্রসারিত।...

১৯০৪ সালের সে-কথা এখনও অনেকে ভুলে যান নি। আবার কি রকম হইচই হোল, সব কাগজে কি ভাবে রাজচন্দ্রবাবুর ছবি বেরুলো, স্টেটস্‌ম্যান সামলে নিয়ে কি কথা লিখলে!— কলেজে প্রিন্সিপ্যাল লসন সাহেব সমস্ত ছেলে ও প্রোফেসার নিয়ে এক সভায় মৃত-আত্মার কি-রকম সম্মান করলেন—সে-আমলের ছাত্রেরা অনেকেই তা এখনও ভোলে নি।

তারপর প্রতিরাত্রে প্রায় ক'মাস ধরে ধূমকেতু ক্রমে নিকট থেকে নিকটে আসতে লাগলো।পুচ্ছটা ক্রমে এক দিকে বেঁকে যেতে লাগলো—কিন্তু মাঝ-আকাশ ছুঁয়ে গেল না—নৈর্ঋত কোণ থেকে বার হয়ে একমাস এগারো দিন পরে ঈশান কোণ কেটে বেরিয়ে চলে গেল।

কোন্ অনন্ত থেকে কোন্ বিশাল কক্ষ-পথে ঘুরে আসছে জানি না—এই প্রথম না এর আগে এসেছিল তাও জানা যায় নি। হয়তো শেষ যখন এসেছিল, আদিম-যুগের বিশাল সমুদ্রতখন জনহীন আদিম-কালের পৃথিবীর বুকে দুলতো...সৃষ্টির তখন সবে শুরু...উত্তাল অগ্নিস্রোত কম্পমান পৃথিবী বাষ্পভরা নির্জন আকাশে বহুদূরাগত তার প্রিয় সন্তানদের স্বপ্ন দ্যাখে...

আবার যখন আসবে ফিরে—হয়তো দশ হাজার বৎসর পরের কোন্ তরুণ-যুগের মানুষেরা তখন তরুণ-দৃষ্টি মেলে পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখবে নতুন আশা, বল ও উৎসাহ নিয়ে। কে জানে?...

যে জানতো—সেও এই ধূমকেতুর মতই অনন্তে মিলিয়ে গিয়েছে—তবে ধূমকেতুটা হয়তো আবার ফিরে আসবে—কিন্তু সে-মানুষটি আর ফিরবে না।

বসুমতীর প্যারাটা পড়তে পড়তে এই সব পুরানো কথাই মনে এল নতুন করে'।